জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৫ , সংখ্যা-১
জানুয়ারি-জুন ২০২৫

ISSN 2519-5816
DOI : https://doi.org/10.3329/jnujarts.v15i1.85311
Page: 39-53

গাজির পটের শিল্পীদের ধর্মীয় ভাবনা

শামীম আরা*

Abstract

Since ancient times, patgaan has been a medium through which the rural populace of Bangladesh has received education. At one time, patuas or pat artists in Bangladesh would earn their livelihood by performing patgaan while simultaneously providing folk education to the impoverished masses. The core elements of patachitra—illustration and music—are not merely blended seamlessly but also inevitably reflect the artists' ambiguous religious stance, a subject that has intrigued researchers and critics from various perspectives. Our discussion centers on Gazir Pat. Through data, references, and field studies, we will explore the origins of pat and patachitra, the artistic conventions of patuas, their religious positioning, and the characteristics of patgaan to determine the multidimensional connections of Gazir Pat. Additionally, by analyzing the customs and social standing of patuas in the context of their religious thought, we aim to uncover new dimensions in this field of research. *Patua-Sangit,* Gurusadaya Datta. *Bangla Lokosahittya,* Ashutash Bhattacharya. *Banglar Chitrakala,* Ashok Bhattacharya. *Banglar Chitrakala Maddhajug Theke Kalighat,* Anjan Sen. *Banglar Pat,* Bishwandha Nanda. *Bangio Lokosonskriticosh,* Barun Kumar Chakraborty. *Lokosonskriti Biswacosh,* Dulal Chowdhury and *Bangladesher Patachitra, Patagitir Patabhumite Nikhilchandra Daser Patashilpe Samaj Bikshan,* Dr. Chittaranjan Maiti. *Gazir Pat,* Ashraf Siddiqi etc. In these books there are the discussions on Gajir Pat and Gaji Pir's story have been the conversation in these books. The religious views of Gajir story's artists have not been discussed. That is why I think there is a need to discuss the matter in detail.

মুখ্যশব্দ: গাজির পট, ধর্মীয় ভাবনা, পটগান, পটুয়া, পটচিত্র

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

'পট' শব্দটি ব্যঞ্জনাময়। শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় – পটি+অ(অচ্)- ণ-বস্ত্র। লেখা বা চিত্র আঁকার জন্য বস্ত্রখণ্ডকেও পট বলা হয়। সংস্কৃত 'পট্ট' শব্দের অর্থ কাপড়। যেটা ইংরেজিতে ক্যানভাস নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে বস্ত্রখণ্ডের উপর অঙ্কিত চিত্রই পট নামে চিহ্নিত হয়। কাপড়ের ওপর যারা ছবি আঁকতেন অতীতে তারাই পট্টিদার > পট্টিকার > পটকার > পটুয়া।[১] 'বুদ্ধদেব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে স্বয়ং যে 'চরণচিত্র'-এর প্রশংসা করেছিলেন তা ছিল পরবর্তীকালের পটচিত্রেরই পূর্বসূরি।'[২]

বুদ্ধদেবের দেখা চরণচিত্রের ব্যাখ্যায় খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের লেখক অশ্বঘোষ জানিয়েছেন এই চরণচিত্রে একটি ছবির নীচে অপর একটি ছবি অঙ্কিত হয়। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে যেমন, পাণিনি ও পতঞ্জলির গ্রন্থেও এমন এক শ্রেণির চিত্রকরের উল্লেখ করা হয়েছে যাঁরা পথের পাশে গান গাইতে গাইতে ছবি দেখিয়ে পথিকদের মনোরঞ্জন করতেন। আচার্য বাণভট্ট তাঁর *হর্ষচরিত*-এ বর্ণনা দিয়েছেন :

> বিপণি-বীথিতে প্রবেশ করলেন হর্ষদেব। তার চোখে পড়ল–যমপট দেখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক যম–পট্টিক।
>
> তাঁর ডান হাতে প্রকাণ্ড শর,
> আর বাম হাতে, –ভীষণ মহিষে-চড়া প্রেতনাথের এক চিত্তির–বিচিত্তির ছবি।
>
> নগরের পথের বালকেরা চীৎকার করছে–"কি হয়েছে, কি হয়েছে ?" দেখছে, আর ভীড় ক'রে সঙ্গে ছুটছে।
>
> যখন শ্রীহর্ষ তাঁর তুরঙ্গ–সৈন্য নিয়ে যমপট্টিককে পিছনে রেখে চলে গেলেন, তখন সে ছড়া আওড়াচ্ছে–
>
> "মাতাপিতৃসহস্রানি পুত্রদারশতানি চ
> যুগে যুগে ব্যতীতানি কস্য তে কস্য বা ভবান্ ।।"
>
> (হাজার হাজার মা আছে, হাজার হাজার বাপ আছে; ওরে, ছেলেও আছে; ওরে, স্ত্রীও আছে। যুগের পর যুগ চ'লে যাচ্ছে, তুই কে, ওরা তোর কে?) ছড়া শুনে শ্রীহর্ষের হৃদয়টা আরও খানিকটা দীর্ণ হয়ে গেল।[৩]

বিশাখা দত্ত প্রণীত সুবিখ্যাত *মুদ্রারাক্ষস* নাটকে (অষ্টম শতাব্দী) যমপটের উল্লেখ রয়েছে।

> [নানাস্থান হইতে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাটলীপুত্রে ফিরিয়া চাণক্যের গৃহে প্রবেশ-মুখে]
> চর–পণমহ জমস্স চলনে কিংকজ্জং দেব এহিং অন্নেহিং।
> এসোক্খু অন্নভত্তানং হরই জীঅং চডপডন্তং ।।
> অপি চ পুরিসস্স জীবিদব্বং বিসমাদো হোই ভত্তিহিগহি আদো ।
> মাবেই সব্বলো অং জো তেন জমেন জী আমো।।
> জাব, এদং গেহং পবিসিঅ জমপডং
> দংসঅন্তো পবিসিঅ গীআইং গাআমি।
>
> এতড্ভিন্ন কালিদাসের(পঞ্চম শতাব্দী?) অভিজ্ঞান-শকুন্তলা এবং মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকদ্বয়ে, ভবভূতির (অষ্টম শতাব্দী) উত্তর-রামচরিত নাটকে চিত্র-লিখন ও চিত্র-দর্শনের বিশেষরূপ উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে পরাশরস্মৃতি, রূপগোস্বামীর বিদগ্ধ-মাধব নাটক এবং গোপালভট্টের হরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থ হইতেও প্রাচীন সমাজে চিত্রানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।[৪]

গবেষক শ্রী গুরুসদয় দত্তের (১৮৮২–১৯৪১) *পটুয়া সঙ্গীত* গ্রন্থ থেকে একজন পটুয়ার, বর্ণনায় উঠে এসেছে আদিম নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি।

> ছবিলাল চিত্রকরের বাস বীরভূমের পানুড়িয়া গ্রামে । তখন তাহার বয়স ষাট বৎসর। তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, কি করিয়া তাহাদের জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। পটুয়া জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে যে কিংবদন্তী পুরুষ পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, নিরক্ষর বৃদ্ধ পটুয়া তাহা বলিতে লাগিল।...
>
> আমাদের একটি পূর্বপুরুষ মহাদেবের বিনা হুকুমে তাঁর ছবি এঁকে ফেলেছিল, তাতে তাঁর ভয় হল যে মহাদেব হয়ত রাগ করবেন।... তখন মহাদেব বললেন, তুলিটি সকড়ি কেন করলে? সে বললে, ভয়ে। মহাদেব বললেন, সে তুলিটা দূরে ফেলে না দিয়ে মুখে দিয়ে সকড়ি করে অন্যায় করেছে। ... মহাদেব বললেন- তোরা হিন্দুও হ'বি না, মুসলমানও হ'বি না। তোরা মুসলমানের রীত কর্‌বি আর হিন্দুর কর্ম কর্‌বি অর্থাৎ ছবি আঁকবি ও পড়বি।
>
> সেই থেকে আমরা মুসলমানদের মত নামাজ করি আর হিন্দুর মত দেব- দেবতার ছবি আকিঁ ও সেই সব গান করি। আর আমাদের নামগুলো সব হিন্দুর মত— যেমন ভক্তি, হরেন্দ্র, নোঙ্গর, পঞ্চানন, সতীশচন্দ্র, গরীব, সমন্ত।[৫]

*ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে*র (একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী) দশম অধ্যায়ে চিত্রকর জাতির উৎপত্তির একটি কাহিনি পাওয়া যায়। তার সঙ্গে অশিক্ষিত ছবিলাল কথিত কিংবদন্তির অনেক মিল আছে বলে মনে করেন শ্রী গুরুসদয় দত্ত।

তাঁর মতে :

> ব্রাহ্মণবেশী ভগবান বিশ্বকর্মার ঔরসে গোপককন্যাবেশী অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রকর জাতির আদিপুরুষ জন্মলাভ করেন। বিশ্বকর্মা ও ঘৃতাচীর পুত্র জন্মিয়াছিল নয় জন :- তাহাদের নাম মালাকার (মালাকর), কর্মকার, শঙ্খকার, কুন্দিবক (তন্তুবায়), কুম্ভকার, কাংস্যকার, সুত্রধার, চিত্রকার (চিত্রকর), ও স্বর্ণকার।
>
> এই হিসাবে পটুয়ারা হিন্দুসমাজের অপর শিল্পী-শ্রেণির সগোত্র, তাহাদেরই মত সম্মানার্হ। চিত্রকরেরা কি কারণে এই সম্মান হারাইয়া সমাজে হীন বলিয়া পরিগণিত হইল, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তাহারও উল্লেখ আছে।[৬]

নবকৃষ্ণ বিশ্বাসের গ্রন্থে একটি তথ্য পাওয়া যায় তা হলো–

> মণ্ডল জাতির আদি বাসভূমি ছিল রাঢ় ও বরেন্দ্র। আর্যরা প্রথম বাংলাদেশে আসে (৩০০-৬০০) খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। আর্য রাজা ঈশান গুপ্ত ব্রাহ্মণ বসতি দেওয়ার জন্য মণ্ডল জাতিকে, তাদের আদি বাসভূমি থেকে বিতাড়িত করে একেবারে সমুদ্র শায়ী করে দেয়। তখন থেকে এই জাতি বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় জেলাগুলো যেমন মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল ও নোয়াখালিতে বসবাস করে আসছে। কোন এক সময়ে এই জাতির মধ্যে পটশিল্পের সূচনা ঘটে।[৭]

ওয়াকিল আহমদ তাঁর *লোকসংস্কৃতি* গ্রন্থে বলেছেন :

> বৌদ্ধ আমলে এদেশে পটচিত্রের প্রচলন ছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। 'মস্করি' উপাধিধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পটচিত্র এঁকে ও পটগীতি গেয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করত। এদের বংশধরেরা হিন্দু আমলে পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনি অবলম্বনে পটচিত্র আঁকা শুরু করে। মুসলিম আমলে তাদের পটচিত্রে মুসলিম কাহিনি যুক্ত হয়। দেখা যায়, কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, গৌরলীলা, মনসালীলা বিষয়ক পটচিত্রের পাশাপাশি গাজি পিরের পালাগান অবলম্বনে গাজির পট, বিবি সোনাভানের কাহিনি অবলম্বনে সোনাভানের পট, কারবালার ঘটনা অবলম্বনে মহরমের পট চিত্রিত হয়েছে। ষোলো শতকে মুসলমান পটুয়া ছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ হলো মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য। কালকেতু কর্তৃক নতুন নগর পত্তনের সময় মুসলিম বসতির বর্ণনায় পটুয়ার উল্লেখ : "পট লৈয়া ফিরে কেহ নগরে নগরে"। (পৃ. ৭৭) চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থেও পটচিত্রের উল্লেখ আছে।[৮]

গাজির পট শীর্ষক আলোচনায় তিনি আরো জানিয়েছেন- 'বিশ শতকের প্রারম্ভেও ঢাকা, রাজশাহী, নোয়াখালী-ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় পটুয়ারা সংগীতসহ পটচিত্র প্রদর্শন করতো বলে জানা যায়।'[৯]

অঞ্জন সেন বলেছেন, চৈতন্যযুগে 'অসংখ্য টেরাকোটা মন্দির, যার অধিকাংশ চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ভাবজগতের। এইসব টেরাকোটা মন্দিরে যে-শিল্পকর্ম দেখা যায়, তা অনেকটাই বাংলার পটচিত্রের শৈলীর সঙ্গে মেলে।'[১০]

স্বপন কুমার গুহ বলেছেন :

> পটগানের ইতিহাস বলতে গেলে গান ও ছবির মাধ্যমে শিক্ষা বা তথ্য প্রচারের প্রাচীন রীতির প্রসঙ্গ চলে আসে। আমাদের দেশের পটুয়ারা বিভিন্ন পটচিত্রের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সচেতন করেছেন সুদীর্ঘকাল। আজকের অডিও ভিজ্যুয়াল বা চলচ্চিত্রের আদিম রূপ হলো পটগান।[১১]

বিমলেন্দু চক্রবর্তী মনে করেন, 'পটুয়ারাই আদিমতর চিত্রকরদের বংশধর একথা বলা যায় কিনা তা ভেবে দেখা উচিত।'[১২]

কারণ পটুয়ারা ছবি আঁকার সঙ্গে পুতুলও নির্মাণ করেন। বিনয় ঘোষ এদের তক্ষণ শিল্পের কাজ করতে দেখেছেন। গুরুসদয় দত্ত পটীদার সুত্রধরের পট সংগ্রহ করেছেন। চিত্রকরেরা একসময় সমাজের শ্রদ্ধার আসনে ছিল। বাংলার ইতিহাসের অনেক গভীর গোপন খবর পটুয়াদের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। পটুয়ারা ধর্মে মুসলমান হয়ে যেমন আত্মরক্ষা করে তেমনি জীবিকার জন্য অনুসরণ করে হিন্দু কাহিনি। পূর্বপুরুষ বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য মুসলমান হলেও ঐতিহ্যের দিক থেকে তারা হিন্দুই থেকে গেছে। মুসলমানেরা যখন বাংলা আক্রমণ করে তখন বাংলার হিন্দুধর্ম অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল ছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতে বিশেষ অত্যাচার প্রয়োজন হয়নি। অনেক পটুয়া মুসলমানদের ধর্ম প্রচারে বাস্তব সহযোগিতা করেছে। 'এমনকি এই সব পটে খোদ মহম্মদের আলেখ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মের কাহিনি চিত্রিত করা হত। (সুধাংশুকুমার রায়)।[১৩] ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি তীব্র ঘৃণা থেকে প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা এর পিছনে কাজ করতো, আবার জাত ব্যবসায়ী বলে, ধর্মবিশ্বাস সব সময় বাঁচিয়ে চলা যায় না এটা তারা বুঝতো। এরাই গাজির পট আঁকিয়ে পটুয়া রূপে পরিচিত।[১৪] মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের কাছে পট জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। পট ছিল তাদের কাছে প্রচারের প্রয়োজনের মাধ্যম। তার উপযোগিতা ক্রমশই কমতে থাকে। 'বাধ্য হয়ে পটুয়ারা হিন্দু দেব-দেবীর কাহিনির জগতে ফিরে আসে।'[১৫] বাংলার পট আঁকিয়েদের 'পটিদার', পটুয়া বলা হয়। আদিবাসী সমাজে এরা পাটকিরি নামে পরিচিত। পটুয়ারা পট আঁকাকে বলে পট লেখা।

জাতিতত্ত্বে পটিদারদের সঙ্গে কুম্ভকার জাতির সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। গুজরাট অঞ্চলে এক রকম পট আছে যাকে বলা হয় 'চিত্রকর্থী'। এই 'চিত্রকর্থী'রা বাংলার পটুয়াদের মতো ঘুরে ঘুরে পট দেখিয়ে বেড়াতো এবং এর আয় দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> হিন্দু মুসলমানের অনাবিল সমীকরণ যদি হয়ে থাকে তবে সে গৌরব বাংলার পটুয়াদেরই প্রাপ্য। অবশ্য বাউলরা আর এক জাতীয় সমীকরণের অপরূপ ইতিহাস তৈরি করেছে। তা হ'ল অন্য প্রসঙ্গের কথা।
>
> পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণঞ্চ কোপতঃ
> বাংলার চিত্রকরদের এই হল নিয়তি।[১৬]

মানবসভ্যতার কোন স্তরে পটুয়াদের আবির্ভাব ঘটেছিল তা বলা যায় না। ধর্মপ্রচার এবং লোকশিক্ষার এই বাহনটির আবির্ভাব সমাজের তাগিদেই ঘটেছিল। ভারতবর্ষের প্রায় সব এলাকাতে পটুয়ার অস্তিত্ব ছিল।[১৭]

চিত্রকর বা পটুয়াদের কথা উল্লেখ রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশিষ্ট গবেষক মহ. মতিয়র রহমান।

তাঁর মতে :

> কোনো এক সময় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা মর্ত্যে ব্রাহ্মণ সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ওই সময়েই দেবনর্তকী ঘৃতাচীও জন্ম গ্রহণ করেন গোপ কন্যারূপে। যথাসময়ে তাঁদের বিবাহ হলে, যে নয় পুত্রের জন্ম হয়, তাঁরা হলেন মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুন্দিবক বা তন্তুবায়, কুম্ভকার, কাংস্যকার, সূত্রধর, চিত্রকর ও স্বর্ণকার। দেবপুত্র হয়েও এ সমাজের পটুয়ারা হিন্দুসমাজের কাছে আজও অচ্ছুত। এরূপ হওয়ার কারণ হিসেবে আপন কর্মদোষের গল্প বলেন এঁরা। পটুয়াগণের কোনো এক পূর্বপুরুষ দেবাদিদেব মহাদেবের বিনা অনুমতিতে তাঁর চিত্র আঁকেন, এর ফলে অভিশপ্ত হয়ে পটুয়াদের মুসলমানের রীতি গ্রহণ করতে হয়েছে এবং হিন্দুর কাজ করে যেতে হচ্ছে। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি গড়া, ছবি আঁকা ও পটের গান করা এঁদের দৈনন্দিন বৃত্তির অন্তর্গত। মুসলমানের রীতি বলতে এঁরা কলমা পড়ে মুসলমান হন। সবসময় মসজিদে না গেলেও বাড়িতে নামাজ পড়েন। সন্তানদের ইসলামিক নাম রাখেন। পুত্র সন্তানদের খাতনা বা মুসলমানি দেন। বিবাহে খোতবা পড়া হয় বা আকত করা হয়। জানাজা হয় মৃত্যুর পর এবং গোর দেওয়া হয়। কিছু সংখ্যক যারা বৈষ্ণব মতে বিশ্বাসী, তাঁদের মৃত্যুর পর জানাজা ও গোর বা দাফন-কাফন হয় না। কিন্তু উৎসব বা পালা পার্বনের ক্ষেত্রে এরা বৃহত্তর, ভারতীয় সংস্কৃতির এক সুনিবিড়-মধুর সমন্বয়ী ধারাকে আজও বহন করে চলেছেন। যেমন, এঁরা সবেবরাত উৎসব পালন করেন এবং এর সমান্তরালে পালন করেন কালীপূজা, ঈদ, বকরিইদ——এর সাথে সাথেই চলে বিশ্বকর্মার আরাধনা, মনসা পূজা ও মহররম পালন। আসলে সমাজ সংস্কৃতির দিক থেকে পটুয়ারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যবর্তী স্থানটিকে অবস্থানগতভাবে আঁকড়ে ধরেছেন।[১৮]

গবেষক মতিয়র রহমান রাজা বল্লাল সেনের গল্পটি তুলে ধরেন। ব্যতিক্রম তথ্য দিয়েছেন সুশীল চক্রবর্তী, তিনি মনে করেন :

> ক্ষেত্রগবেষণালব্ধ তথ্য ও লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বের আলোকে মনে হয় যে, পটের ন্যায় একটি আদিম বিশ্বাসসঞ্জাত লোকশিল্পের সংস্কৃত 'পট্ট' প্রভাবজাত 'পট' নামকরণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর্য ব্রাহ্মণ্যসমাজে ও শাস্ত্রপুরাণে কথিত-নিন্দিত পটুয়াসমাজ ও পটশিল্প আর্য আগমনের পূর্ববর্তী শিল্পকলা বলে মনে হয় এবং 'পট' শব্দ সংস্কৃত বা আর্যভাষার পূর্ববর্তী ভাষা হওয়াই সম্ভব।[১৯]

উদ্দেশ্য

বাংলার পট, পটচিত্র এবং পটের গান পটুয়ার নিজস্ব সম্পদ। গাজি পিরের কাহিনি অবলম্বনে যে পটগুলো তৈরি হয়েছিল তা প্রায় বিলুপ্তির পথে। লোকসংস্কৃতির এই সুবিশাল ধারাটি নিয়ে স্বতন্ত্র একটি গবেষণা পরিচালিত হতে পারে।

গবেষণার পরিধি

গাজি পির কে ছিলেন এবং গাজি পিরের কাহিনি অবলম্বনে চিত্রিত পটচিত্র সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণ, চিত্রিত পটগুলোতে ধর্মীয়ভাবনা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাঠ্যপুস্তক ও সৃজনকৌশল অনুযায়ী আলোচিত হবে।

গবেষণা পদ্ধতি

পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও ক্ষেত্র সমীক্ষা পদ্ধতি

অবস্থান ও পরিবেশ অনুযায়ী পটের বিষয় ও শৈলীতে বিভিন্নতা রয়েছে। বিষয় বিচারে বাংলার পত্রচিত্রকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা হয়।[২০]

১. সাঁওতাল উপজাতির জন্মকথা ও তাদের মধ্যে প্রচলিত চক্ষুদান পট
২. যমপট
৩. গাজির পট এবং
৪. হিন্দু পুরাণ, *রামায়ণ-মহাভারত*, মঙ্গলকাব্য, কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা পট।

সাঁওতাল প্রধান অঞ্চলের শিল্পীরা প্রধানত সাঁওতাল উপকথা অনুযায়ী তাদের জন্মকথা চিত্রিত করতেন। এক শ্রেণির পটের চল দেখতে পাওয়া যায় তার নাম 'চক্ষুদান' পট। 'যখনই কোনো পুরুষ, নারী অথবা শিশু মারা যায়, তখনই মৃত্যের কল্পিত একটি ছবি এঁকে জাদুপটুয়া হাজির হন শোকসন্তপ্ত সাঁওতাল গৃহে।

দ্বিতীয় শ্রেণির 'যমপট' ও 'চক্ষুদান' পটের মানসিকতাকে পরলৌকিক হলেও যমপট বিশেষভাবে সমতল বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই প্রচারিত হয়ে এসেছে। যমপটে 'যম' বা 'ধর্মরাজে'র বিচারে দণ্ডিত ব্যক্তির নরকযন্ত্রণা আর পুরস্কৃত ব্যক্তির স্বর্গসুখের দৃশ্যাবলি আঁকা আছে। তৃতীয় শ্রেণির পটগুলি হলো মুসলমানি পট পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার মুসলিম ধর্মযোদ্ধা গাজির মাহাত্ম্য ও পিরদের বীরত্ব এবং অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত রয়েছে এই শ্রেণির পটে। তাই সাধারণত এগুলি 'গাজির পট' নামে পরিচিত। অশোক ভট্টাচার্য বলেছেন :

> এই গাজিপটের মধ্যেও লৌকিক ব্যাঘ্রদেবতা, বনবিবি প্রমুখের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। অঙ্কনরীতিতেও গাজিপট বিশেষ দক্ষতার পরিচয় বহন করে না। কালুগাজির পট পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় বিশেষ জনপ্রিয়। ময়মনসিংহ জেলাতেও পটচিত্রের যথেষ্ট চল ছিল।[২১]

পির বড়খাঁ গাজি কে ছিলেন : পির বড়খাঁ গাজি বহু নামে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসমাজে পরিচিত। বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন

'গাজি বাবা, বড়খাঁ গাজি, গাজি সাহেব, মোবারক শাহ গাজি, বরখান গাজি ইত্যাদি। উত্তর-চব্বিশপরগণায় বারাসাত-বসিরহাট অঞ্চলে বড়খাঁ গাজির একাধিক দরগাহ-নজরগাহ আছে।[২২]

বড়খাঁ গাজির জীবন সম্বন্ধে বহু কাহিনি প্রচলিত আছে। তাঁর একাধিক জীবনচরিত পাওয়া যায়। এসব কাহিনির ভিতর তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের কথা তো রয়েছেই তার সঙ্গে রয়েছে ইসলাম ধর্ম প্রচারক হিসেবে তাঁর কৃতিত্বসূচক নানা ঘটনার কথা। এক্ষেত্রে বিনয় ঘোষের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> ...অনেক উপাদান গাজি সাহেবের বিভিন্ন কাহিনি-কিংবদন্তির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হিন্দু-মুসলমানের ধর্মবিরোধ এর মধ্যে প্রকট নয়, বরং ধর্মের ভিতর দিয়ে লোকায়ত স্তরে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আন্তরিকতায় অনেক বেশি প্রবল।[২৩]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বেলে-আদমপুর (মতান্তরে বৈরাটনগর) গ্রামে বড়খাঁ গাজির জন্ম। অন্যন্য স্থানে জন্মস্থান ভিন্ন নামে আছে। গাজি সাহেব বেশ সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। পরনে পায়জামা, চোগাচাপকান, পিরান, মাথায় টুপি, মুখে ঘন লম্বা দাড়ি, আকর্ণবিস্তৃত গোঁফ, দীর্ঘ গালপাট্টা জুলফি, বড়-বড় টানা চোখ, একহাতে অস্ত্র, অন্যহাতে ঘোড়ার লাগাম। বুটজুতো সমেত পা-দুটো

রেকাবের উপর স্থাপিত। বেশ বড় ঘোড়ার পিঠে চড়ে থাকেন। গাজি সাহেবের এই মূর্তি খাড়ি গ্রামে দেখা যায়। গ্রাম্য কবিরা তাঁর রূপের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে

হাসা চিতা দুটি বাঘ আছে দুই দিগে
গাজির মাথায় জট দেখে দুই বাঘে।।
অথবা,
মাথায় চিকন কালা হাতে ছিলিমিলি মালা
গাজি পড়ে বসিয়া কোরাণ।[২৪]

গাজির পটেও এধরনের মূর্তি দেখা যায়। গাজি পিরের বিবাহ হয় যশোর জেলার ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের কন্যা চম্পাবতীর সঙ্গে। তাঁর দুই পুত্র দুঃখী গাজি ও মেহের গাজি। ঘুটিয়ারী শরীফ গাজি সাহেবের কবরস্থান। মুসলমানদের পূণ্যতীর্থ, হিন্দুদেরও। প্রত্যেক বছর ৭ আষাঢ় থেকে গাজির তিরোধান উপলক্ষে এক সপ্তাহ ধরে উৎসব ও মেলা হয়। ১৭ শ্রাবণ থেকে যে উৎসব ও মেলা হয় তাতে লোকসমাগম হয় প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ হাজারের মতো।

বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে আজও গাজি কালু ও চম্পাবতীর মাজার বর্তমান। 'গাজি কালু চম্পাবতী' পুঁথির কাহিনিতে সোনারপুর নাম প্রসঙ্গে একটি গল্প রয়েছে বলে জানান বিনয় ঘোষ। তৃতীয় মতে, পঞ্চদশ শতকের পির ইসমাইল গাজিই হলেন আলোচ্য বড়খাঁ গাজি।

গাজির পট : বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে বিশেষত ঢাকা, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালি, মুন্সিগঞ্জ, যশোর, খুলনা, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে বিনোদনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল গাজির পট। খগেশকিরণ তালুকদার মন্তব্য করেছেন :

> পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের মতো কোনো চিত্রোপজীবী সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গে নাই। পূর্ববাংলার প্রধানত নাগরচি সম্প্রদায়ই গাজির পট দেখিয়ে বেড়াতো। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "তবে পূর্ববঙ্গে একসময় আনুষ্ঠানিক মনসার পট, বিশেষত গাজির পট খুবই বিখ্যাত ছিল। গাজির পটের বিষয়বস্তু গাজির পুঁথি ও পালা। সিলেট, ময়মনসিংহে এখনও নাগরচি সম্প্রদায়ভুক্ত পটুয়ারা গাজির পট দেখিয়ে, গাজির পালা পরিবেশন করে থাকেন।[২৫]

পটশিল্পীদের সকলেই বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। গাজির পট সাধারণত গ্রামে গঞ্জে বাড়ির উঠানে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। কুশীলবরা জুড়ি, ঢোল, চটি প্রভৃতি বাজিয়ে গান গায় আর পট প্রদর্শন করে। এ সময় পটে অঙ্কিত চিত্রসমূহ একটি লাঠির সাহায্যে নির্দেশ করে তা সুর, তাল ও কথার সাহায্যে বর্ণনা করে।

নির্দিষ্ট কোনো কাহিনির পরিবর্তে গাজির পটের বর্ণনাংশে তিনটি বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটে।

১. গাজি পিরের মাহাত্ম্য ও অলৌকিক ক্ষমতা
২. কৌতুক মিশ্রিত হিতোপদেশ
৩. মৃত্যু তথা যমরাজের ভয়।

গবেষক শাহনাজ হুসনে জাহান লীনা বাংলাদেশের দুজন গাজির পট কুশীলবের সন্ধান পেয়েছেন। তারা হলেন নরসিংদী জেলার হাজিপুর গ্রামের দুর্জন আলী এবং অপরজন একই জেলার বেদে পাড়ার কোনাই মিয়া।[২৬]

মুন্সীগঞ্জের কালিন্দীপাড়ায় শম্ভু আচার্যের বাড়িতে একসময় কিছু পটুয়া আসতেন, তাঁরা হলেন— সোনাই মিঞা, কোনাই মিঞা, দুর্জন আলী ও গেরুয়া পোশাক পরা দরবেশ।

'বাংলার চিত্রকলার দু'টি ধারা প্রবহমান– লৌকিক ও দরবারি চিত্রশিল্প। লোকচিত্রশিল্পের ধারাটির শেকড় প্রোথিত রয়েছে বলিষ্ঠ অতীত ঐতিহ্যে'।[২৭]

মুসলিমদের মধ্যে গাজির কিস্সার চিত্রিত রূপ 'গাজির পট' আবির্ভূত হয় পনেরো শতক থেকে। রিসালাত-আল-আহদাহ (ইসমাইল গাজির জীবনবৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ) হতে জানা যায় যে, শাহ্ ইসমাইল গাজি মক্কায় নবির (সাঃ) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল হতেই ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং নিজেকে শিক্ষা দান ও ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত করেন। তিনি বাংলার সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯-৭৪) এর রাজত্বকালে লক্ষণাবতীতে আসেন। তিনি শীঘ্রই তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করে সুলতান কর্তৃক গাজি উপাধিপ্রাপ্ত হন এবং রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে আসীন হন। জানা যায়, 'অচিরেই তিনি ঘোড়াঘাট দুর্গের হিন্দু অধিনায়ক ভান্দসী রায়ের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সুলতানের আদেশে ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ইসমাইল গাজির শির রংপুরের কাঁটাদুয়ারে (কান্তদুয়ার) এবং মস্তকবিহীন দেহ হুগলী জেলার মান্দারনে সমাধিস্থ করা হয়।[২৮]

আলোচ্য ইসমাইল গাজির মাহাত্ম্য কাহিনি নিয়ে ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শেখ ফয়জুল্লাহ *গাজি বিজয়* রচনা করেন। সেখানে ইসমাইল গাজিকে রংপুরের খোঁটা দুয়ারের পির হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।[২৯]

সতের শতকের মধ্যবর্তী সময় হতে মৌখিকভাবে পির বড়খাঁ গাজিকে কেন্দ্র করে রচিত কিংবদন্তিমূলক কাব্যের সাথে গাজির পটের কেন্দ্রীয় চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং গাজির পটের উদ্ভব সতের শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বা তার কিছু পরে হয়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। পটুয়াদের মিশ্র জাতিতত্ত্বের ও ধর্মতত্ত্বে এরা ধর্মে মুসলমান ও সংস্কারে হিন্দু। আচার-আচরণে অর্ধেক মুসলমান ও অর্ধেক হিন্দু রীতির শিকড়টি প্রোথিত রয়েছে অতীত ভারতের বর্ণবিন্যস্ত সমাজের অনেক গভীরে। লক্ষণীয় হলো ইসলামের অবাধ সম্প্রসারণ ও পটুয়াদের জাতিচ্যুতির বিষয়টি। *ব্রহ্মবৈবর্ত* পুরাণে রয়েছে, "ব্যতিক্রমেণ চিত্রানাং সদ্যশ্চিত্র করস্ত থা। পতিতো ব্রহ্ম শাপেন ব্রাহ্মানানাঞ্চ কোপত।"[৩০]

বৌদ্ধযুগে এরা রাজশক্তি ও সমাজের কাছে বিশ্বস্ত ছিল, এরা যুদ্ধ ও গুপ্তচরবৃত্তির কাজও করেছিল। কালেকালে তাদের বৃত্তিতে যে পরিবর্তন এসেছিল তা ছিল নিম্নমুখী। উপজাতীয় ধর্মভাবনা সচল হয়েছে, পটুয়াদের মারাংবুরু বাঘুৎ বোঙা, ধর্মরাজ, সিঞবোঙা, জাহের এরা চক্ষুদান ও ধারতি সৃষ্টিতত্ত্বের পটচিত্রে ও পটগীতে। মুসলমান প্রধান এলাকায় এরা জগন্নাথ পট, মনসাপট, মারংবুরু পট, যমপট তুলে ধরে সত্যপীরের গান শুনিয়ে আসে। অথচ ধর্মে এরা হিন্দু। বৈচিত্র্যময় বৃহৎ ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের মানুষকেও বর্ণ ব্যবস্থার কঠোর নীতির মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়েছিল। উচ্চবর্ণের খ্রিস্টানরা নিজেদের যেমন বলতেন ব্রাহ্মণ বা নায়ার খ্রিস্টান, ধর্মান্তরিত মুসলমানরাও অনুরূপভাবেই নিজেদের চিহ্নিত করতেন। যেমন : রাজস্থানের রাজপুত বা ত্যাগী মুসলমান। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের হুসাইনি ব্রাহ্মণ। 'এঁরা নিজেদের উৎস চিহ্নিত করতেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দৌহিত্র এবং হযরত আলীর (রাঃ) পুত্র হুসাইন থেকে।'[৩১]

উপজাতি স্তরেও এর প্রভাব লক্ষ করা যায় যেমন শাইখওয়াত উপজাতি। জানা যায় সম্রাট আকবরের নিঃসন্তান হিন্দু অফিসার 'রাইসিল' পির শায়খ-বুরহানের দোয়াতে পিতা হন, এবং পুত্রের নাম রাখেন শায়খজি। ইনিই উপজাতি শাইখওয়াত মুসলিম গোষ্ঠীর কুলপতি ছিলেন।[৩২] সানওয়াসিস নামক হিন্দুধর্মের উপজাতিও ছিল। যাঁরা ইসলাম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। জানা যায় এঁরা নামাজ পড়া, কোরান শরিফ পড়া, রমজানে উপবাস করা, মুহররম, সবেররাত, ঈদ, বকর ঈদ পালন করা, শূকরের মাংস না খাওয়া ও ইসলামের নাম অনুসারেই সন্তানদের নামকরণ করে থাকেন।[৩৩]

জন্মানুষ্ঠান

শিশুজন্মের পর ছয়দিন পালিত হয় ষটি বা সেঁটেরা লোকাচারটি। ফিরনি বা পায়েস রান্না করে প্রতিবেশীকে বিতরণের রেওয়াজ আছে। এখনো বহু মুসলিম পরিবারে যা হয় সবই পটুয়ারা পালন করে থাকেন। যেমন : সিজ বা নিমের ডাল টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয় আঁতুর ঘরের দরজায়। আঁতুড় ঘরের দরজার কোণে রাখা হয় দা-কাস্তে বা একখণ্ড লোহা। একটি থালার মধ্যে রাখা হয় কাগজ কলম। ধারণা করা হয় ভাগ্য দেবতা জিবরাইল (আঃ) এসে নবজাতকের ভাগ্য লিখে যাবেন। সবকিছু করা হয় নবজাতক ও মা উভয়ের মঙ্গলের জন্য।

মুখেভাত

মুসলমান সমাজে যে 'আকিকা' অনুষ্ঠানটির প্রচলন আছে পটুয়ারা সেটা হিন্দুদের মতো অন্নপ্রাশনের মতো পালন করে। নবজাতকের সাত বা নয় মাস অথবা বে-জোড় মাসে 'ভুজনো' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানটি প্রতিটি পটুয়া পরিবারেই পালিত হয়।

সুন্নৎ, মুসলমানি বা খাতনা

পটুয়াদের মধ্যে যাদের সিংহভাগ ইসলাম মেনে চলেন তাদের প্রতিটি পুরুষ সন্তানের তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে খাতনা বা মুসলমানি করানো হয়। খাতনা দেওয়ার জন্য রয়েছে 'হাজাম-সম্প্রদায়'।

বিবাহকালীন আচার

পটুয়াদের মধ্যে বিবাহকালীন আচারে সমন্বিত রূপ দেখা যায়। যেমন : হলুদ মাখানো, আইবুড়ো ভাত, অষ্টমঙ্গল, সাতপাক ইত্যাদি আচারগুলো একদিকে যেমন পালিত হয় অন্যদিকে মূল বিবাহ বা নিকা পড়ান মৌলবি। বিয়েতে উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারে দেনমোহর ধার্য করা হয়। বিবাহে খুতবা বা দোয়ার পর মেয়ের সম্মতি চাওয়া হয় সবার সম্মুখে। ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী মেয়ের পক্ষের নিকটআত্মীয় কোনো ব্যক্তিকে উকিল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। মুসলিম রীতিতে বিবাহ সম্পন্ন হলেও বিবাহিত নারীরা শাঁখা ও সিঁদুর ব্যবহার করে থাকে।

মৃত্যুকালীন আচার

মৃত্যুকালীন আচার-অনুষ্ঠানে পটুয়ারা ইসলামকে অনুসরণ করে। একজন মৃতব্যক্তির কাছে কোরানশরিফ জানা লোক উপস্থিত থাকলে তিনি কোরানের প্রয়োজনীয় অংশ পড়ে শোনান। মৃত ব্যক্তির পোশাক পালটে পরিস্কার কাপড় অর্থাৎ কাফন (সেলাইবিহীন সাদা কাপড়) পড়ানো হয়।

মৃতদেহে আতর, গোলাপজল ও কর্পূর লাগানো হয়। যারা মৃতদেহ স্পর্শ করবে, স্বাভাবিকভাবে তাদের পাক পবিত্র থাকতে হবে।

> জানাজা হলো মৃতের জন্য সম্মিলিত প্রার্থনা।[৩৪] নিয়ম অনুসারে ইমাম ব্যতীত জানাজার তিন-কাতার বা তিন উর্ধ্ব বে জোড় হওয়া প্রয়োজন। মৃতের মাথা থাকবে সবসময় উত্তরে এবং মুখ পশ্চিম দিকে কাত হয়ে বা হেলে থাকবে। এরূপ থাকাকে কেবা (কাবা) মুখী বলা হয়।
> কবর সাধারণভাবে সাড়ে তিন হতে চার হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। কবর যত লম্বা হবে, তার অর্ধেক অংশ চওড়া ও সাড়ে তিন হাত গভীর হওয়া নিয়ম।[৩৫] কবরে নামানোর সময় যে দোয়াটি পড়া হয় সেটি হলো "বিসমিল্লাহে আল্লা-মিল্লাতে রসুলিল্লাহে"। – অর্থাৎ "আল্লাহর নামের সঙ্গে ও রসুল (সাঃ) এর ধর্মের ওপর নির্ভর করে এই মুর্দাকে কবরে রেখে দিলাম।"

চাহাররম

পটুয়ারা মৃত্যুর চতুর্থ দিনে চাহাররম পালন করে থাকেন। দোওয়া, দরুদ, কোরান শরীফ পাঠের সঙ্গেই চালের রুটি, ক্ষীর, ফিরনি ইত্যাদি তৈরি করে আত্মীয়স্বজন ও ফকিরদের দেওয়া হয়।

চল্লিশা বা চল্লিশে

কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর চল্লিশ দিন ধরে কোরান শরিফ পাঠ, মৃতের নামে ভাত দেওয়া, দানখয়রাত করা, দোয়া চাওয়া, এসব নিয়ম পালন করেন পটুয়া সমাজ। চল্লিশ দিনে মৌলবি ডেকে ইসলামিক নিয়মে কুলখানি ও খতম পড়ানো হয়ে থাকে এবং আত্মীয়স্বজন, ফকির-মিসকিন, পাড়াপ্রতিবেশী ও মৌলবিদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায় পটুয়া সমাজ।

ড. প্রদ্যোতকুমার মাইতি তাঁর *মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি গ্রন্থে* পট ও পটুয়া সংগীত আলোচনায় উল্লেখ করেছেন :

> ওপর থেকে বলতে গেলে পটুয়ারা ধর্মে মুসলমান। তাঁদের সামান্য সংখ্যক হিন্দু হয়েছেন। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এঁরা হিন্দু মুসলমানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন।... উৎসবাদি ও ধর্মীয় কৃত্যাকৃত্যে দুই ধর্মেরই প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিবাহ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে যেমন হিন্দুর প্রভাব স্পষ্ট, তেমনি পারলৌকিক কৃত্য শরিয়ত নির্দেশে পালিত হয়।[৩৬]

মহরম বা মুহররম

সমস্ত মুসলিম সমাজে আরবি প্রথম মাস মহরম দিয়ে বছর শুরু হয়। মহরম মাসেই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই মাসেই ধ্বংস হবে বলে কথিত আছে। পটুয়ারা এই মহরম মাসটিকে মুসলিম সমাজের মতো করে উদ্‌যাপন করে।

শবেবরাত

পবিত্র শবে বরাতের দিবাগত রাতে নামাজ ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে কৃতকর্মের পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই প্রার্থনাময় উৎসবটি মুসলিম সমাজ ও পটুয়া সমাজের নিকট নানাদিক থেকেই আনন্দ ও সৌভাগ্যের বাহক।

ঈদ-উল-ফিতর

ঈদের দিন পটুয়াগণ নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ পরেন, আতর, গোলাপ লাগিয়ে ঈদগাহে যান নামাজ পড়তে। ক্ষীর, চালের রুটি, লুচি. মাংস, পোলাও সামর্থ্য মতো রান্না করে খাওয়ান আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে। পটুয়াগণ ঐদিন সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

ঈদ-উল-আযহা

এই উৎসবটি পটুয়াগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকেন। আরবি জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে কোরবানির জন্য উপযুক্ত পশুর জীবন উৎসর্গ করে আনন্দ উৎসব করার নামই কোরবানি ঈদ বা ঈদ-উল-আযহা।

বিশ্বকর্মা পূজা

সবাই বিশ্বকর্মারই সন্তান, তারপরও কেন তাদের আলাদা করে চিন্তা করা হয় এটা নিয়ে পটুয়াদের মধ্যে গল্প ও উপগল্পের শেষ নেই। বিশ্বকর্মা পূজায় অংশগ্রহণ করে পটুয়ারা ধর্মকে নয়, ধর্মের মানবিক দিকটিকে সম্মান দেখায়।

দুর্গোৎসব

দুর্গাপূজার উৎসবে অংশগ্রহণ করে পটুয়ারা তাদের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আজও স্মরণ করে চলেছেন। পটুয়াদের কাছে দুর্গোৎসব অত্যন্ত আনন্দের উৎসব। আবাহন, বোধন ও বিসর্জন রাজকীয় এই উৎসবটি তারা মনেপ্রাণে উপভোগ করেন এবং নতুন পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হন পটুয়ারা।

লক্ষ্মীপূজা

কৃষিসমাজের দরিদ্র পটুয়ারা খাদ্যের অন্বেষণেই লক্ষ্মীর দরজায় এসে দাঁড়ায়। পটুয়াদের ধারণা, কার্তিক মাসের শেষ দিনে কার্তিক সংক্রান্তি বা ডাক সংক্রান্তির রাত্রে দেবী লক্ষ্মী ধানের ক্ষেতে ঘুরে বেড়ান।

মনসাপূজা

চিত্রে অথবা বিচিত্র পটের উল্লেখেই শুধু নয়, পটুয়াদের সঙ্গে মনসার সম্বন্ধটি বিষহরি বিদ্যার দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত। পটুয়ারা সিজডালের মধ্যে দিয়েই মনসা দেবীকে স্মরণ করেন।

বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠানের প্রকাশ দেখা যায় পটুয়াদের দৈনন্দিন সামাজিক লোকাচারে। যেমন : গো-মঙ্গল ব্রত, নবান্ন বা লবান, জামাইষষ্ঠী, ডাকসংক্রান্তি, ভাইফোঁটা ইত্যাদি।

> ‘পির’ ফারসি শব্দ; ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘বৃদ্ধ ব্যক্তি’। ‘অধ্যাত্মিক গুরু’ মুসলমান সাধকগণ পির আখ্যা পেয়ে থাকেন। ... হিন্দুর ‘গুরু’, নাথ সম্প্রদায়ের যোগী, বৌদ্ধের ‘থের’ এবং মুসলমানের পির সমার্থক শব্দ।[৩৭]

‘গাজি’ আরবি শব্দ। এর অর্থ মুসলিম ধর্মযোদ্ধা, মুসলমান সম্প্রদায়ের পদবি অর্থেও ‘গাজি’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বাউলতত্ত্বের পরিভাষায় পিরকে মুর্শিদ বলা হয়। জানা যায় —

> বাংলায় সকল পূজ্য পিরদের মধ্যে গাজিপিরের প্রভাবই ব্যাপকতর। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসাম— সর্বত্র আজও কৃত্যপালা হিসেবে গাজির গান আদৃত। লোকায়ত সমাজে তিনি সর্ববিপদভঞ্জন পির।[৩৮]

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু *বাংলার লৌকিক দেবতা* গ্রন্থে বলেছেন :

> বড়খাঁ গাজি দক্ষিণ বাংলার অন্যতম লৌকিক দেবতা। ইনি দক্ষিণরায়, বনবিবি প্রভৃতির মত বন অঞ্চলের ব্যাঘ্রকুলের অধিকর্তা বলেই প্রসিদ্ধ। এঁকে ‘জিন্দাপির’ বা গাজিসাহেব বলেও অভিহিত করা হয়। লৌকিক দেবতার পূজকদের মধ্যে জাতি-ধর্ম ভেদাভেদ নেই। ... গাজি সাহেবের থানের কর্তা ফকিররা। এঁরা পূজা হাজোতের অন্তে সুর করে বলেন :

গাজি মিঞার হাজোত
সিন্নি সম্পূর্ণ হল।
হিন্দুগণে বল হরি
মোমিনে আল্লা বল।।[৩৯]

সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'মুসলমান কবির গাজিমঙ্গল নিবন্ধকে হিন্দু কবির রায়মঙ্গল নিবন্ধের প্রতিরূপ বলা চলে।'[৪০] *রায়মঙ্গলে* বর্ণিত ঈশ্বরের মূর্তির অনুরূপ 'গাজির গানে' গায়েন-অভিনেতার পোশাকে হিন্দু-মুসলমানি পোশাকের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস লক্ষণীয়। সচরাচর গাজির গানের গায়েন, শরীরের নিম্নাংশে ধূতি, উর্ধ্বাংশে চাপকান এবং মাথায় মখমলের কিস্তি টুপি পরে থাকে।[৪১]

প্রায় দেড়শ' বছর পূর্বে যে সমস্ত পটুয়ার কথা জানা গেছে তারা সবাই হিন্দু। 'পটুয়ারা মুসলমান হয়েছে বিগত দেড়শ' বছরের মধ্যে।'[৪২] লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই সময় হিন্দু সমাজের মধ্যে ভাঙন দেখা যায়, রামকৃষ্ণদেব বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করেন এইভেবে যে হিন্দুরা যেন মুসলিম, ব্রাহ্ম অথবা খ্রিস্টান হয়ে না যায়। এই সময় হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণরা এবং ক্ষত্রিয়রা গোঁড়ামি করে, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার করে। 'যে সমস্ত পটুয়া প্রতিমা তৈরি করতো তারা প্রতিমার চোখে শেষ তুলির টান দেওয়ার পর আর প্রতিমা ছুঁতে বা দেখতে পারতো না।'[৪৩]

পটুয়ারা হিন্দু দেব-দেবীর ছবি আঁকায় মুসলমান সমাজও তাদের গ্রহণ করেনি। আমরা গত **১৫.০৭.২০২৫** খ্রি. তারিখে ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম নড়াইলের নিখিলচন্দ্র দাসের বাড়িতে। নড়াইল জেলার পূর্বদিকে ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট। পশ্চিমে যশোর। উত্তরে ঝিনাইদহ, দক্ষিণে খুলনা। পূর্বপাশে মধুমতী নদী প্রবাহিত। মাঝে নবগঙ্গা নদী ও চিত্রা নদী। বাংলাদেশের এই অংশ নিয়েই নড়াইল ঘরানার শিল্পীরা শিল্পচর্চা করেন। এই ঘরানার পটুয়া চিত্রশিল্পীদের অন্যতম হলেন নিখিলচন্দ্র দাস। বাবার নাম বিমলচন্দ্র দাস, মাতার নাম সূর্যরানি দাস। গ্রাম মাউলি, উপজেলা কালিয়া, জেলা নড়াইল।

বাংলাদেশের এই গুণী পটচিত্রশিল্পীর কর্মযজ্ঞ নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন ড. চিত্তরঞ্জন মাইতি। তাঁর গ্রন্থটির নাম— *বাংলাদেশের পটচিত্র, পটগীতির পটভূমিতে নিখিলচন্দ্র দাসের পটশিল্পে সমাজবীক্ষণ*।

হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের সমন্বয়ী রূপটি সম্পর্কে নিখিলচন্দ্র দাসের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান—

> বাংলাদেশ থেকে বহু পটুয়া পরিবার ভারতের মেদিনীপুর ও অন্যান্য জায়গায় বসতি স্থাপন করেছে তাদের মধ্যে এই সমন্বয়ী রূপটি দেখতে পাওয়া যায় তবে বাংলাদেশের গাজির পটের শিল্পীরা কোন হিন্দু বাড়িতে পটচিত্র দেখাতে গেলে তারা গাজি পিরকে প্রণাম জানায়। পটুয়াশিল্পীদের দুটি করে নাম থাকে, তারা যখন হিন্দু বাড়িতে যায় তখন হিন্দু নামটি ব্যবহার করে আবার যখন মুসলিম বাড়িতে যায় তখন মুসলিম নাম ব্যবহার করে।[৪৪]

নিখিলচন্দ্র দাসের বক্তব্যের সঙ্গে ড. সুব্রত কুমার মান্নার বক্তব্য হুবহু মিলে যায়। ড. সুব্রত কুমার মান্না বলেছেন :

> সামগ্রিকভাবে পটুয়ারা না হিন্দু না মুসলমান গোছের হলেও বর্তমানে পটুয়ারা মূলত ইসলাম ধর্মাবলম্বী। হয়তো মধ্যযুগে হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতায় বাধ্য হয়ে নতুবা ইসলামধর্ম গ্রহণ করে পটুয়ারা সামাজিক নির্ভরতা পেতে চেয়েছে। তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ধর্মীয় সংস্কারের চেয়ে জীবিকানির্ভর

> জীবনধারণের তাগিদই বরাবর বারেবারে ধর্মান্তরণের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। তাই অধিকাংশ পটুয়ার দুটি করে নাম— একটি হিন্দু নাম অপরটি মুসলমানের যেমন– পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়াগ্রামের মুসলিম ধর্মাবলম্বী সামসুদ্দি চিত্রকরের হিন্দু নাম শ্যামসুন্দর চিত্রকর, দিলবাহার চিত্রকরের হিন্দুনাম দুলাল চিত্রকর। এই নয়াগ্রামের পটুয়ারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়েও আশেপাশের অঞ্চল হিন্দু প্রধান হওয়ায় কখনো কখনো গোমাংস ভক্ষণ করে। দৈনন্দিন জীবনাচরণে মুসলমান পটুয়ারা সাধারণত একবার নামাজ পড়ে। তবে, জুম্মাবারে (শুক্রবারে) সমস্ত পটুয়াই নামাজ পড়ে। হিন্দু পটুয়ার বাড়িতে ভোরবেলা মঙ্গলশঙ্খ বাজানো হয়, তুলসীতলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দেওয়া হয় এমনকি হিন্দু পটুয়া রমণীরা একাদশীর উপবাস, ধর্মপূজা, বিপদতারিণীর ব্রত কিংবা স্বামীসেবার জন্য কৃষ্ণচতুর্দশীর ব্রত যেমন পালন করে তেমনি শাঁখা সিঁদুর, চুড়ি ইত্যাদিও পরিধান করে।[৪৫]

আমরা গত ১৮.০৭.২০২৫ খ্রি. তারিখে ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম মুন্সীগঞ্জের গাজির গানের শিল্পী মঙ্গল আলীর বাড়িতে। মঙ্গল আলীর পৈতৃকবাড়ি চাঁদপুর জেলার ছেঙ্গারচর থানার বেলতলী গ্রামে। তাঁর পরিবারে তিনি চাচাতো ভাই এবং শ্বশুর গাজির গানের শিল্পী ছিলেন। বর্তমানে তিনি একটি দল তৈরি করেছেন। 'মঙ্গল আলীর দল' নামে গাজির গানের এই দলটি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গাজির গান প্রদর্শন করে আসছে। তিনি বর্ণনা করেছেন— গাজির পিতা শেখ বাদশা সেকেন্দর, মাতার নাম ওজুবা সুন্দরী, গাজির ভাইয়ের নাম জুলহাস, তারা সহদর। গাজি এবং জুলহাস দল নিয়ে আল্লাহর দিদার লাভ করার জন্য সুন্দরবনের দিকে যায়। গাজি ভাই জুলহাসকে নিতে চায় না কিন্তু জুলহাস জোরপূর্বক গাজির সঙ্গে যায়। যাওয়ার পর ১২ বছর পর্যন্ত জঙ্গলে অবস্থান করে। তাদের মাতা কেঁদে কেঁদে চোখ অন্ধ করে ফেলে। মাতা দাসী বাঁদী নিয়ে নদীতে গোসল করতে গেলে একটি সিন্দুক ভাসতে দেখে দাসীরা সিন্দুকটি ধরতে গেলে তা সরে নদীর মাঝে চলে যায় কিন্তু গাজির মাতা যখন সিন্দুকের কাছে গেলেন তখন সিন্দুকটি তার কাছে আসে। কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যে ২০০ জন লোক এই সিন্দুকের ঢাকনা খুলতে পারবে না কিন্তু গাজির মাতা বিসমিল্লাহ বলে ঢাকনা খুলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা খুলে যায়। ঢাকনা খুলে দেখা যায় একটি ছোট শিশু। গাজির মাতা শিশুটিকে দেখে ভাবলেন আমার দুই ছেলে ১২ বছর হলো নিরুদ্দেশ। আমি আমার মাতৃত্বের সাধ পূর্ণ করব এই শিশুটিকে সন্তানের মতো লালন করে। আজকে থেকে এর নাম দিলাম গাজির ভাই– কালু। মঙ্গল আলীর মুখে শোনা গানটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> অমন পোলারে জঙ্গল ঘিরিল বনের বাঘে
> প্রথমে বন্দনা করি আল্লাহর নবীর নাম
> তারপরে বন্দনা করি জিন্দাপিরের নাম
> তারপরে বন্দনা করি কালুগাজির নাম
> গাজির বাপের নাম বাদশাহ সেকেন্দর
> চৌদ্দ বছর লড়াই করছে জঙ্গলার ভিতর
> পাতাল থুইয়া করছে বিয়া ওজুবা সুন্দরী
> সেই ঘরেতে জন্ম নিল পির জিন্দাগাজি।[৪৬]

মঙ্গল আলীর বক্তব্যে উঠে এসেছে গাজির গানের মাহাত্ম্য। গাজি পিরের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে ও জেনে নিম্নবর্ণের বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। গাজি পির হিন্দুদের কাছে 'সাধুবাবা' হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। গাজির হাতে একটি লাঠি ছিল (গাজির আশা/আশাদানা)। গাজির গানের শিল্পীরা গাজির আশা নিয়ে হিন্দু বাড়িতে গিয়ে জল চাইতো। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা জল নিয়ে

এসে এক টুকরো জায়গা জল দিয়ে লেপে আশাটি সেখানে স্থাপন করে তাকে ভক্তি দিতো। তখন শিল্পীরা গান শুরু করতো। এভাবে হিন্দুরা গাজি পিরকে দেবতার আসনে বসিয়েছিল।

উপসংহার

পটুয়াদের জীবনে ধর্মীয় ভাবনা ও উৎসব-আচার পদ্ধতি সমভাবেই হিন্দু ও ইসলামিক আচার বিশ্বাসের দ্বারা সম্প্রসারিত ও প্রভাবিত। পটুয়ারা চিত্র আঁকেন, মূর্তি গড়েন, নামাজ পড়েন অথচ মসজিদে যান না। ইসলাম মতে বিবাহ হয় অথচ বিবাহের পরে শাঁখা সিঁদুর পরেন। গো-পূজা করেন, বাঁধনা পরব উপভোগ করেন, সত্যপীরের মানত করেন, পিরের দরগায় যান আবার অসুখে বিসুখে মৌলবি সাহেবের জলপড়া খান আবার লক্ষ্মীব্রতও পালন করেন। এভাবেই পটুয়াগণ তাদের দৈনন্দিন জীবনে হিন্দুধর্ম ও মুসলিম ধর্মকে যেমন আঁকড়ে ধরেছেন তেমনি লোকাচারে বা সংস্কারের ক্ষেত্রে উভয় ধর্মের সমন্বয়ের একটি ভিত্তি তৈরি করেছেন যা অনেকেরই অজানা রয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. ড.চিত্তরঞ্জন মাইতি, *প্রসঙ্গ : পট, পটুয়া ও পটুয়াসঙ্গীত*, (কলকাতা : সাহিত্যলোক, ২০০১), পৃ. ২১

২. অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২), পৃ. ৯০

৩. শ্রী প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, *হর্ষচরিত*, (কলকাতা : রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ, কলিকাতা, ১৩৫৯), পৃ. ১৬৮

৪. ড. শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই.সি.এস, *পটুয়া সঙ্গীত*, (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯), পরিচায়িকা অংশ।

৫. তদেব

৬. তদেব

৭. নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *এস এম সুলতান-অন্তরঙ্গজীবনকথা*, (ঢাকা : কথামালা প্রকাশন, ২০১৩), ভূমিকা

৮. ওয়াকিল আহমদ, *লোকসংস্কৃতি*, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ১৬৯

৯. তদেব

১০. অঞ্জন সেন, *বাংলার চিত্রকলা মধ্যযুগ থেকে কালীঘাট*, (ঢাকা : সংবেদ, ২০১৯), পৃ. ২৫

১১. স্বপন কুমার গুহ, 'লোকনাট্যধারায় রূপান্তরিত রূপান্তরের পটগান', আমিনুর রহমান সুলতান (সম্পাদিত), *লোকভাবনা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, জুন ২০২৫, ঢাকা, পৃ. ২৩

১২. বিমলেন্দু চক্রবর্তী, 'পট', আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত, *সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র*, একবিংশ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৮০, কলকাতা, পৃ. ১১০

১৩. তদেব, পৃ. ১১১

১৪. তদেব

১৫. তদেব

১৬. তদেব, পৃ. ১১০

১৭. তদেব. ১০৯

১৮. মহঃ মতিয়র রহমান, *পটুয়াগীত সমন্বয়ী সংস্কৃতির ধারা*, (কলকাতা : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৬), পৃ. ২-৩

১৯. সুশীল চক্রবর্তী, *লোকায়ত বাংলা, লোকচিত্রকলা, পট নামের উৎস*, (কলকাতা : কল্যাণী প্রকাশন, ১৯৬৯), পৃ. ৯

২০. অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২), পৃ. ৯৩

২১. তদেব, পৃ. ৯৪-৯৫

২২. বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, *তৃতীয় খণ্ড*, (কলকাতা : প্রকাশ ভবন, ২০০৮), পৃ. ২৪৫
২৩. তদেব, পৃ. ২৪৬
২৪. তদেব, পৃ. ২৪৭
২৫. মহঃ মতিয়র রহমান, *পটুয়া গীত সমন্বয়ী সংস্কৃতির ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭
২৬. শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৬), পৃ. ১৭১
২৭. পারভীন হাসান, "স্থাপত্য ও চিত্রকলা", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, *সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৭), পৃ. ৫০৯
২৮. এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫), পৃ. ১১৬
২৯. আজহার ইসলাম, *মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে মুসলিম কবি*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯২), পৃ. ৪৬
৩০. মহঃ মতিয়র রহমান, *পটুয়া গীত সমন্বয়ী সংস্কৃতির ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪
৩১. তদেব, পৃ. ১৮৬
৩২. তদেব
৩৩. তদেব
৩৪. তদেব, পৃ. ১৮৯
৩৫. তদেব, পৃ. ১৯০
৩৬. তদেব, পৃ. ১৯১
৩৭. ওয়াকিল আহমদ, *লোকসংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫-৩০৬
৩৮. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, জুলাই, ২০১৮), পৃ. ২৭৩
৩৯. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা*, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮), পৃ. ৬১
৪০. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৭), পৃ. ৪৭২
৪১. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*, পূর্বোক্তি, পৃ. ২৭৫
৪২. ড. সুব্রত কুমার মান্না, *বাংলার পটচিত্র পটুয়াসংগীত পটুয়া সমাজ ও লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান*, (কলকাতা : ফার্মা কে এল এম, ২০১২), পৃ. ৪৫
৪৩. তদেব
৪৪. সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ১৫.০৭.২০২৫ খ্রি. তারিখ, পটচিত্র শিল্পী, নিখিলচন্দ্র দাস, নড়াইল, বাংলাদেশ।
৪৫. ড. সুব্রত কুমার মান্না, *বাংলার পটচিত্র পটুয়াসংগীত পটুয়াসমাজ ও লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫
৪৬. সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ১৮.০৭.২০২৫ গাজির গানের শিল্পী মঙ্গল আলী, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা, বাংলাদেশ।